র ণ ম য় স র কা র

না, কাদম্বরী দেবীর কোনো সুইসাইড-নোট নেই

প্রাক্‌কথন

চারদিকে এখন অনেক রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ। তাঁদের বিশ্লেষণ, তাঁদের বক্তব্যেই এখন রবীন্দ্রজীবনকে নতুনভাবে চিনতে হচ্ছে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রশান্তকুমার পাল—এঁরা এখন অনেক দূরের মানুষ। রবীন্দ্রজীবন নিয়ে তথ্য পরিবেশনে এখন বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই, সেন মশাই, শাকুর মশাইদের রমরমা। যতদিন যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ সহজপাচ্য হয়ে যাচ্ছেন। তাঁর দর্শনকে জীবনে সাঙ্গীকৃত করার পরিবর্তে বাঙালি তার নিজস্ব জীবনবোধে মিশিয়ে নিচ্ছে লঘু চপলতা। গোপাল হালদার তাঁর 'সংস্কৃতির রূপান্তর' গ্রন্থে বলেছিলেন—'সংস্কৃতি বলিতে মানস-সম্পদও বুঝায়—চিন্তা, কল্পনা, দর্শন, ধ্যানধারণা এইসবও বুঝায়...।' সংস্কৃতির সন্ত্রাসবাদীরা এই সু-চিন্তা, সু-দর্শন, সু-ধ্যানধারণার ওপরেই সবচেয়ে আঘাতপ্রবণ। আপনি সমসময়ে ভাঙনটি টেরও পাবেন না, যখন বুঝতে পারবেন তখন সংস্কৃতি এমনিই পচে গিয়েছে যে প্রতিরোধও তখন মূক।

রবীন্দ্রনাথ এখন পণ্য। তাঁর জীবন বিকৃত করে 'নভেল' লেখা যায়। বাজারে চলবে ভালো। বছরের-পর-বছর ধরে, যে নিরন্তর অধ্যবসায়, মননকে পুঁজি করে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রশান্তকুমার পালের মতো মানুষ রবীন্দ্রনাথকে জেনেছেন ও জানিয়েছেন, রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়দের মতো মানুষ সেই অধ্যবসায়কে করেছেন অগ্রাহ্য। কোনোরকমভাবে ইতিহাসকে অপমানিত করতে পারলেই হল। অনবরত এইসব অভাজনের অপরিশীলিত নিন্দিত প্রয়োগকুশলতা, সংস্কৃতির অবয়বকে, প্রবহমানতাকে কলুষিত করে চলেছে। একটি সুসংস্কৃতির জনক যে সময়, তার অংশী হওয়ার চেয়েও কঠিন, একটি সুসংস্কৃতির ধারক যে সময়, তার অংশী হওয়া। রবীন্দ্রনাথের

মতো ব্যক্তিত্বদের জীবন বিকৃত করে নভেল লিখলে আঘাত আসে সংস্কৃতির ওপরেও। আমাদের যাপিত জীবনের আশেপাশে থাকা যে অসংখ্য বাঙালি (যাঁরা তত্ত্ব সম্পর্কে খুব একটা আগ্রহী নন) তাঁদের কাছে রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়দের মতো মানুষরা রবীন্দ্রজীবন সম্পর্কে শেষ কথায় রেফারেন্স হয়ে ওঠেন। সংস্কৃতির বহতা শরীরে কীটাক্রান্ত ধারণাগুলো মান্যতাও পেয়ে যায়। সত্য, নন্দন ও ইতিহাসকে অস্বীকার করে রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়রা রবীন্দ্রনাথকে কলঙ্কিত করার খেলায় মেতে ওঠেন।

অবয়বে

সুনির্দিষ্টভাবে এই আলোচনার প্রধান উপজীব্য রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত গ্রন্থ 'কাদম্বরীদেবীর সুইসাইড-নোট' এবং ওই গ্রন্থটিতে পরিবেশিত কল্প তথ্যের চিহ্নিতকরণ। যুগপৎভাবে যে ঘটনাপ্রবাহকে আশ্রয় করেছে এ নভেল সেটি এবং ওই ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের চরিত্র নির্মাণ ও উপস্থাপনে রঞ্জনবাবুর সীমাবদ্ধতাকেও আলোকিত করা হবে। যদিও ইতিমধ্যে বইটির একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। তবে সবচেয়ে বিপজ্জনক যেটা, একটা বৃহৎ অংশের পাঠক বইটি পড়ে বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন—এটি প্রকৃতই কাদম্বরী দেবীর সুইসাইড-নোট। এবং রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজস্ব উদ্ভাবনের জন্য পাঠকের মনে এই বিশ্বাসটাও গেঁথে গিয়েছে যে রবীন্দ্রনাথের জন্যই, বা বলা ভালো বিবাহিত রবীন্দ্রনাথের জন্যই কাদম্বরী দেবী আত্মহত্যা করেছেন। রবীন্দ্র-কাদম্বরী সম্পর্ক বহু-বহু-বহু চর্চিত একটি বিষয় এবং ক্লিশে হয়ে যাওয়া একটি জনধারণা। কিন্তু কোনোরকম বাছবিচার না করে দীর্ঘকাল ধরে পাঠককুল এই বিষয়টি নিয়ে আলোড়িত থেকেছেন আর রঞ্জনবাবুর মতো মানুষরা এই ধারণাটিকেই কাজে লাগিয়েছেন সৃজনশীলতার আড়ালে।

কিছু তথ্যের উল্লেখ প্রসঙ্গক্রমেই করতে হয় এখানে—

অ) কাদম্বরী দেবীর জন্ম জুলাই ৪, ১৮৫৯; ২১ আষাঢ় ১২৬৬ বঙ্গাব্দ

আ) রবীন্দ্রনাথের জন্ম মে ৭, ১৮৬১; ২৫ বৈশাখ, ১২৬৮ বঙ্গাব্দ

ই) কাদম্বরী দেবীর বিবাহ জুলাই ৫, ১৮৬৮; ২৩ আষাঢ় ১২৭৫

ঈ) রবীন্দ্রজননী সারদাদেবীর মৃত্যু ঘটে, মার্চ ১০, ১৮৭৫

উ) রবীন্দ্রনাথের বিবাহ ডিসেম্বর ৯, ১৮৮৩

ঊ) কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু এপ্রিল ১৯, ১৮৮৪

যদিও তাঁর জন্মপ্রসঙ্গে 'বেঙ্গলী' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক পদ্মিনীমোহন নিয়োগীকে ২৬ ভাদ্র ১৩১৭ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'আমার জন্মের তারিখ ৬ই মে ১৮৬১

খৃষ্টাব্দ।' তবে এই প্রসঙ্গটি বর্তমান প্রসঙ্গের আলোচ্য নয়। সংশ্লিষ্ট তথ্যগুলোকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ কাদম্বরী দেবীর থেকে বয়সে বাইশ মাসের ছোটো। সারদাদেবীর মৃত্যুকালীন সময়ে রবীন্দ্রনাথের বয়স প্রায় চোদ্দো বছর। কাদম্বরী দেবীর বিবাহকালীন সময়ে রবীন্দ্রনাথের বয়স সাত বছর দু'মাস। রবীন্দ্রনাথের বিবাহকালীন বয়স বাইশ বছর সাত মাস এবং কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুকালীন সময়ে রবীন্দ্রনাথের তেইশ পূর্ণ হতে মাত্রই কিছুদিন বাকি। রবীন্দ্র-জীবনের মাতৃহীন প্রায় ন'টি বছরে ঠাকুরবাড়িতে ছিল কাদম্বরী দেবীর উপস্থিতি।

দুই

কাদম্বরী দেবীর বিবাহ পূর্ববর্তী নাম কাদম্বিনী। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্রজীবনকথা'য় জানাচ্ছেন '...জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী কাদম্বিনী হয়েছিলেন কাদম্বরী...।' বিয়ের আগেই ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে কাদম্বরী দেবীর যোগসূত্র ছিল। সুব্রত রুদ্র তাঁর 'কাদম্বরী দেবী' (প্যাপিরাস। নববর্ষ ১৪০৯ সংস্করণ। পৃষ্ঠা-১১) গ্রন্থে জানাচ্ছেন—

> কুশারীবংশের জয়রাম ঠাকুরের কনিষ্ঠ সন্তান গোবিন্দরাম ঠাকুর। এঁর সঙ্গে বিবাহ হয় খুলনার দক্ষিণডিহী গ্রামের নন্দরাম গঙ্গোপাধ্যায়ের মেয়ে রামপ্রিয়া দেবীর। গোবিন্দরামের মৃত্যুর পর রামপ্রিয়া দেবী তাঁর বিষয়-আশয় গোবিন্দরামের অগ্রজদের কাছ থেকে আলাদা করে নেন সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে। রামপ্রিয়া ভ্রাতুষ্পুত্র জগন্মোহনকে প্রতিপালন করতে শুরু করেন, তাঁকে কলকাতার হাড়কাটা অঞ্চলে একখানা বাড়ি করে দেন। তিনি জগন্মোহনের বিবাহ দেন দ্বারকানাথ ঠাকুরের মামা কেনারাম রায়চৌধুরীর মেয়ে শিরোমণির সঙ্গে। ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে রামপ্রিয়ার সম্পর্ক আগেই ছিল, কুশারী বংশের পঞ্চানন ঠাকুর ছিলেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরদেরও আদিপুরুষ...। জগন্মোহনের পাঁচ সন্তানের মধ্যে দ্বিতীয় রসিকলালের দুই মেয়ের বিবাহ হয় দ্বারকানাথের ভাগ্নে আর দাদার পৌত্রের সঙ্গে। ঠনঠনের শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের মেয়ে ত্রৈলোক্যসুন্দরীকে বিবাহ করেছিলেন জগন্মোহনের চতুর্থ সন্তান শ্যামলাল। তাঁর চার মেয়ের তৃতীয়া হচ্ছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী কাদম্বরী দেবী, রবীন্দ্রনাথের নতুন বৌঠান।

কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর তারিখটি নিয়ে সংশয় আছে। তাঁর 'রবীন্দ্রবর্ষপঞ্জি' (দে'জ পাবলিশিং। ১৪১৩ মাঘ, জানুয়ারি ২০০৭ সংস্করণ। পৃষ্ঠা-২৩) গ্রন্থে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন দিনটি এপ্রিল ১৯, ১৮৮৪; ৮ বৈশাখ ১২৯১ বঙ্গাব্দ। কিন্তু প্রশান্তকুমার পালের তথ্য অন্য কথা বলছে, তাঁর 'রবিজীবনী' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে প্রশান্ত পাল জানাচ্ছেন '...কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর তারিখটি নির্দিষ্ট করা সম্ভব না হলেও,

অনুমান করা যায় ৮ ও ৯ বৈশাখ দুদিন ডাক্তাররা তাঁর জীবন রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সম্ভবত ৯ বৈশাখ [রবি 20 Apr] রাত্রে বা ১০ বৈশাখ [সোম 21 Apr] প্রভাতে তাঁর জীবনাবসান ঘটে।'

তিন

এবারে কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুপ্রসঙ্গ। 'রবীন্দ্রজীবনকথা'য় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী কাদম্বরী দেবী অকস্মাৎ আত্মহত্যা করলেন; কারণ অজ্ঞাত' (আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড অগ্রহায়ণ ১৩৯২, আনন্দ মুদ্রণ, পৃষ্ঠা-২৭)। কেন এই মৃত্যু? কেন যে মানুষ আত্মহত্যা করেন তার যথোপযুক্ত ব্যাখ্যা কেউ কি দিতে পেরেছেন কখনো? এক্ষেত্রে কিছু অনুমানের ওপর আলোকপাত করা যাক। ইন্দিরা দেবী তাঁর নতুন কাকিমা অর্থাৎ কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু সম্পর্কে জানাচ্ছেন (অমিতাভ চৌধুরীর 'অন্য রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের—'নতুন দাদা' অংশে, পৃষ্ঠা-৩৫-৩৬)।

> নতুন কাকিমা জেদী মেয়ে ছিলেন। একদিন জ্যোতিকাকা মহাশয়কে বললেন, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরো। জ্যোতিকাকামশাই প্রায়ই বাড়ি ফিরতেন না। তাঁর প্রধান আড্ডা ছিল বিরজিতলাওয়ে আমাদের বাড়ি। আমার মা জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সঙ্গে ওঁর খুব ভাব ছিল। সেদিনও যথারীতি সন্ধেবেলা আমাদের বাড়িতে এসেছেন জ্যোতিকাকামশাই। আড্ডায় আড্ডায়, গানে গানে এমন দেরী হয়ে গেল, সে রাত্রে আর জোঁড়াসাঁকো ফিরলেন না। পরদিন যখন বাড়ি ফিরলেন, নতুন কাকিমার মুখ থমথমে—কথাই বললেন না। তাঁর অভিমান হলো প্রচণ্ড,...। তার দুদিন পরেই অঘটন। আমাদের জোড়াসাঁকো বাড়িতে এক কাপড়ওয়ালা আসত, তার নাম বিশু। সেই বিশুকে দিয়ে নতুন কাকিমা লুকিয়ে আফিম আনালেন। সেই আফিম খেয়েই নতুন কাকিমার সব শেষ।

তাহলে তো এমন দাবিও করতে পারেন কেউ, যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মৃণালিনী ওরফে ভবতারিণী দেবীর বিয়ের জন্য নয়, বরং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বউদি জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর ঘনিষ্ঠতাই কাদম্বরী দেবীকে আত্মহত্যার পথে প্ররোচিত করেছে! কিন্তু আদৌ কি এই ধারণাকে মান্যতা দেওয়া যায়? জনৈকা নাট্যাভিনেত্রীর সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সম্পর্কের ছায়াও কেউ কেউ দেখতে পান এই মৃত্যুর পেছনে। খুব নাটকীয়ভাবে কাদম্বরী দেবীর আত্মহত্যার ছবি আঁকতে গিয়ে 'প্রথম আলো' (অখণ্ড আনন্দ সংস্করণ, জুন ২০১২, পৃষ্ঠা ২৪৩-৩৪৪) উপন্যাসে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন—

> কাদম্বরী ছুটে গেলেন পাশের ঘরে। চাবি দিয়ে খুললেন দেয়াল-আলমারি। তার ভেতরের একটি গুপ্তস্থান থেকে বার করলেন একটি গয়নার বাক্স, চন্দন কাঠের তৈরি, ওপরে

হাতির দাঁতের কারুকাজ করা। এই পেটিকায় স্বর্ণালঙ্কার নেই, শুধু হীরে-চুনী-পান্না-মুক্তোর মালা। সেগুলি সরিয়ে সরিয়ে তলা থেকে বার করলেন একটা কাগজের মোড়ক। এরমধ্যে রয়েছে চারখানা কালো রঙের বড়ি, এই বড়ি খেলে পাখি হয়ে উড়ে যাওয়া যায়। বিশু নামে এক কাপড়উলির কাছ থেকে এগুলো সংগ্রহ করে রেখেছেন কাদম্বরী। কাপড় বেচতে আসে বটে, কিন্তু এই বিশু একজন দেয়াসিনী, অনেক জড়ি-বুটি, শিকড়-বাকড়ের গুণ জানে। সে ঘুমের ওষুধ দেয়। একটু ঘুম, বেশি ঘুম, গহন ঘুম; মরণ ঘুম। এই গয়নার বাক্সের মধ্যেই সযত্নে রক্ষিত আছে তিনখানি চিঠি। এর মধ্যে একখানি কাদম্বরী পেয়েছিলেন ধোপার কাছে কাচতে দেবার আগে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এক জোব্বার পকেটে, অন্য দুটি এক বৃহদাকার অভিধানের ভাঁজে। তিনটি চিঠিই, একই মেয়েলি হস্তাক্ষরে লেখা, সম্বোধনে প্রাণাধিকেষু, তলায় কোনও নাম নেই।

...চিঠিগুলি মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তিনি একসঙ্গে চারটি কালো বড়িই খেয়ে ফেললেন। জল পান করলেন দু'গেলাস।

তবে এটা কিন্তু উপন্যাস। অবশ্যই কাদম্বরী দেবীর জীবন-ইতিহাস নয় এবং কাজী আবদুল ওদুদ-কৃত 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থটি থেকে সুনীল এই ধারণাটি আশ্রয় করেছিলেন বলে অনুমিত হয়।

চার

রবীন্দ্রনাথ ও কাদম্বরী দেবীর সম্পর্কের প্রকৃত প্রকৃতি কী, এই বিষয়ে বাঙালির কৌতূহল আজও তুঙ্গে। এর সুস্পষ্ট উত্তর কিন্তু হাতের কাছেই আছে। মাতৃহারা কিশোর রবীন্দ্রনাথের কাছে কাদম্বরী দেবী ছিলেন স্নেহের প্রধান আধার। 'রবীন্দ্রজীবনকথা'য় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—'...জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী রবীন্দ্রনাথ যখন নিতান্ত বালক তখনই বধূরূপে আসেন এ বাড়িতে। ইনি নিঃসন্তান ছিলেন, তাই তাঁর মাতৃহৃদয়ের সমস্ত স্নেহ গিয়ে পড়েছিল দেবরের উপর।' রবীন্দ্রনাথ স্ব-লেখনেই নির্ণয় করে গিয়েছেন তাঁর সঙ্গে কাদম্বরীদেবীর সম্পর্কের প্রকৃতি—

ক. এমন সময় একদিন বাজল সানাই বারোয়াঁ সুরে। বাড়িতে এল নতুন বউ, কচি সামলা হাতে সরু সোনার চুড়ি। পলক ফেলতেই ফাঁক হয়ে গেল বেড়া, দেখা দিল চেনাশোনার বাহির সীমানা থেকে মায়াবী দেশের নতুন মানুষ। দূরে দূরে ঘুরে বেড়াই, সাহস হয় না কাছে আসতে। ও এসে বসেছে আদরের আসনে, আমি যে হেলাফেলার *ছেলেমানুষ*।

বউ ঠাকরুণের জায়গা হল বাড়ি-ভিতরের ছাদের লাগাও ঘরে। সেই ছাদে তাঁরই হল পুরো দখল। পুতুলের বিয়েতে ভোজের পাতা পড়ত সেইখানে। নেমন্তন্নের দিনে প্রধান ব্যক্তি হয়ে উঠত এই *ছেলেমানুষ*। বউঠাকরুণ রাঁধতে পারতেন ভালো, খাওয়াতে ভালোবাসতেন, এই খাওয়াবার শখ মেটাতে আমাকে হাজির পেতেন। ইস্কুল থেকে ফিরে এলেই তৈরি থাকত তাঁর আপন হাতের প্রসাদ। চিংড়িমাছের চচ্চড়ির সঙ্গে পান্‌তা ভাত যেদিন মেখে দিতেন অল্প একটু লঙ্কার আভাস দিয়ে, সেদিন আর কথা ছিল না।—'ছেলেবেলা', নবম অধ্যায়। (বক্র হরফ স্বকীয়)

খ. বাড়িতে যিনি কনিষ্ঠা বধূ ছিলেন তিনিই মাতৃহীন বালকদের ভার লইলেন। তিনিই আমাদিগকে খাওয়াইয়া পরাইয়া সর্বদা কাছে টানিয়া আমাদের যে কোনো অভাব ঘটিয়াছে, তাহা ভুলাইয়া রাখিবার জন্য দিনরাত্রি চেষ্টা করিলেন।

'জীবনস্মৃতি', অধ্যায় -'মৃত্যুশোক'।

গ. সাহিত্যে বউঠাকুরাণীর প্রবল অনুরাগ ছিল। বাংলা বই তিনি যে পড়িতেন কেবল সময় কাটাইবার জন্য, তাহা নহে—তাহা যথার্থই তিনি সমস্ত মন দিয়া উপভোগ করিতেন। তাঁহার সাহিত্যচর্চায় আমি অংশী ছিলাম।

'জীবনস্মৃতি', অধ্যায়-'সাহিত্যের সঙ্গী'

পাঁচ

গ্রন্থপাঠের ইল্যুশানে

- **কল্পিত নোট**

আলোচনার সুবিধার্থে আমরা এখন থেকে 'কাদম্বরীদেবীর সুইসাইড-নোট' বইটিকে সংক্ষেপে 'কা. সু. নো' নামে চিহ্নিত করব। বইটির প্রাক্-কথন অংশের শুরুতে রঞ্জনবাবু লিখেছেন, 'শোনা যায় আত্মহত্যার কারণ জানিয়ে তিনি একটি সুইসাইড-নোট লিখেছিলেন।' এখন অনেকগুলো প্রশ্ন—কোন সূত্রে শোনা যায়? কে বলেছিলেন এ কথা? এই বক্তব্যের প্রামাণিক ভিত্তি কোথায়? আট সংখ্যক পৃষ্ঠার প্রথমেই লেখক বলছেন 'আমি ধরে নিলাম কাদম্বরী দেবীর সেই সুইসাইড-নোটটি হঠাৎ পাওয়া গেল...। ধরে নিলাম সেই ঝলসানো সুইসাইড-নোটের পাঠোদ্ধার সম্ভব হল শেষপর্যন্ত!' যদি 'ধরে' নিতেই হয় তাহলে কা. সু. নো-র প্রচ্ছদেই কেন মুদ্রিত হল না—'এটি একটি কাল্পনিক অনুমান মাত্র'? কেন মুদ্রিত হল 'রবীন্দ্রনাথের নতুন বউঠানের শেষ চিঠি'? বারো সংখ্যক পৃষ্ঠায় লিখছেন 'সেই সুইসাইড নোট লুপ্ত ছিল একশো সাতাশ বছর। সেটি পাওয়া গিয়েছে সম্প্রতি!' কোথা থেকে পাওয়া গেল? ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে,

নাকি কোনো আর্কাইভ থেকে? কার সৌজন্যেই বা পাওয়া গেল? সুইসাইড নোটটির একটা স্ক্যান ফোটোগ্রাফি তো দেওয়া যেতে পারত, দিলেন না কেন? আসলে যে চিঠি বা নোটের কোনো বাস্তব অস্তিত্বই নেই সেটিকে কেন্দ্র করে হয়তো কল্প নভেল লেখা যায়, কিন্তু প্রমাণ করার কিছু থাকে না। আর নভেলে ঐতিহাসিক চরিত্র ও তথ্যের বিকৃতি ঘটানো কিন্তু অমার্জনীয় অপরাধ।

◆ প্রসঙ্গ বিহারীলাল

'ঠাকুরপো, তোমার অনেক আগে আমার প্রেমে পড়লেন কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী। তিনি তোমার নতুনদাদার বন্ধু। তাঁর সূত্রেই বিহারীলাল আসেন এ-বাড়িতে।'

কা. সু. নো.। পৃষ্ঠা-৭৭

'বিহারীলাল বললেন, 'তুমিই আমার সারদামঙ্গল কাব্যের সরস্বতী।"

কা. সু. নো.। পৃষ্ঠা-৭৮

কাদম্বরী দেবীর বয়ানে পরিবেশিত দুটি তথ্যই ভুল। ইতিহাস বিকৃত করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে প্রশান্তকুমার পালের তথ্য হল—'বিহারীলালের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতা ছিল, সেই সূত্রে ঠাকুরবাড়িতেও তাঁর যাতায়াত ছিল। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তথা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের সূত্রপাত ভারতী পত্রিকার সূত্রে ১২৮৪ বঙ্গাব্দের শেষ দিকে...।' (রবিজীবনী, দ্বিতীয় খণ্ড। পৃষ্ঠা ৭৩)। অর্থাৎ নতুনদাদার সূত্রে নন, দ্বিজেন্দ্রনাথের সূত্রেই ঠাকুরবাড়িতে বিহারীলালের প্রবেশ। আর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আগেই তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে পরিচিত হচ্ছেন বিহারীলাল, ঠাকুরবাড়ির তৎকালীন পারিবারিক আবহে এই তথ্য মেনে নেওয়া অসম্ভব। দ্বিতীয়ত, প্রশান্তকুমার পালের তথ্যানুযায়ী '...১২৮১ বঙ্গাব্দে আর্য্যদর্শন-এ প্রকাশিত সারদামঙ্গল কাব্যের বিমুগ্ধ পাঠক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ' (সূত্র-পূর্বোক্ত)। এবং ১২৮৪ বঙ্গাব্দের শেষ দিকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছেন বিহারীলাল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সূত্রেই বিহারীলালকে চিনছেন কাদম্বরী দেবী। অর্থাৎ ১২৮৪ বঙ্গাব্দের তিন বছর আগে ১২৮১-তে আর্য্যদর্শনে যখন 'সারদামঙ্গল কাব্য' প্রকাশিত হচ্ছে তখন, বিহারীলাল এবং কাদম্বরী দেবী একে অপরের সঙ্গে ব্যক্তিগত সূত্রে পরিচিত নন। তাহলে কোন যুক্তিতে বিহারীলাল বলবেন—'তুমিই আমার সারদামঙ্গল কাব্যের সরস্বতী'? উভয়ের সাক্ষাতের আগেই তো 'সারদামঙ্গল' রচিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর একটি মন্তব্য স্মরণীয়—'বিহারীলাল চক্রবর্তীর প্রতি কবি বলে নতুন কাকিমার এত ভক্তি ছিল যে, তিনি নিজের হাতে তাঁর জন্যে একটি পশমের আসন বুনে দিয়েছিলেন।' (রবীন্দ্রস্মৃতি,

পৃষ্ঠা-৬৪)। 'ভক্তি' শব্দটির প্রতি বিশেষ আলোকপাতের অনুরোধ করি। রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে অবলীলায় বিহারীলাল চক্রবর্তী, কাদম্বরী দেবীর প্রেমিক হয়ে গেলেন। কী আশ্চর্য!

◆ জন্ম-বিবাহ বিভ্রাট

'...১৮৬৮-র ৫ জুলাই, আমার জন্মদিনে তোমার উনিশ বছরের নতুনদাদার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেল।' কা. সু. নো.। পৃষ্ঠা-৩৯

'মনে পড়ছে, সেদিন ছিল ৫ জুলাই। আমার জন্মদিন। আবার বিয়ের দিনও।'

কা. সু. নো.। পৃষ্ঠ-৬৭

তথ্য বিকৃতির আর একটি উদাহরণ। সুব্রত রুদ্র তাঁর 'কাদম্বরী দেবী' গ্রন্থে, কাদম্বরী দেবীর জন্মদিন হিসেবে চিহ্নিত করেছেন আষাঢ় ২১, ১২৬৬ বঙ্গাব্দ; জুলাই ৪, ১৮৫৯ দিনটিকে। এবং কাদম্বরী দেবীর বিবাহের দিন আষাঢ় ২৩, ১২৭৫; জুলাই ৫, ১৮৬৮। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের তথ্যও (রবীন্দ্রবর্ষপঞ্জি, পৃষ্ঠা-১৫) একই কথা বলছে। এই বিবাহ সংবাদটি শ্রাবণ ১২৭৫-এর 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। অথচ রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়—কাদম্বরী দেবীর জন্মদিন ও বিয়ের দিনের তারিখটি এক—এই তথ্যটি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন ইতিহাসকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে।

◆ প্রত্যাগমন হেতু

'কিন্তু কেন তুমি বিলেত গেলে না ঠাকুরপো? পাছে ঠাকুরবাড়ির মহিলামহলের বিষাক্ত পরিবেশে একাকিত্বের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে আমি আবার আত্মহত্যার চেষ্টা করি—তাই তো? তুমি ফিরে এলে আমার আশ্রয় হয়ে!'

কা. সু. নো.। পৃষ্ঠা-৭৬-৭৭

মোটেই কাদম্বরী দেবীর কারণে রবীন্দ্রনাথকে ফিরতে হয়নি। প্রশান্তকুমার পাল স্পষ্ট জানিয়েছেন—'এই অনুমানের সমর্থন বা বিরুদ্ধতা করার মতো কোনো তথ্য আমাদের কাছে নেই।' (রবিজীবনী। দ্বিতীয় খণ্ড। পৃষ্ঠা-৬৯)। এই বিষয়ে সন্দীপন সেনের বক্তব্যটি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ।—'১৮৮১-র এপ্রিল মাসে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাগ্নে সত্যপ্রসাদের সঙ্গে বিলেতের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেন, কিন্তু পথে নববিবাহিত ও পত্নী-অদর্শনে বিরহকাতর সত্যপ্রসাদের পীড়াপীড়িতে মাদ্রাজ থেকেই তাঁকে ফিরে আসতে হয়—কারণ সত্যপ্রসাদ একা ফিরে দেবেন্দ্রনাথের বিরাগভাজন হতে চাননি।' (আহাম্মকের রবীন্দ্রচর্চা। পৃষ্ঠা-৭০)। ঠিক একই ধারণার পরিচয় পাচ্ছি প্রভাতকুমার

মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্যতে—'সত্যপ্রসাদ সদ্যোবিবাহিত, সুতরাং ঘরে ফিরে আসবার একটা হৃদ্‌গত কারণ অবশ্যই থাকতে পারে; সত্যপ্রসাদ ফিরলেন বলেই রবীন্দ্রনাথকেও ফিরতে হল।' (রবীন্দ্রজীবনকথা। পৃষ্ঠা-২১) অথচ রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমাণ করতে চাইলেন রবীন্দ্রনাথের বিলেতে না গিয়ে ফিরে আসা কাদম্বরী দেবীর কারণেই। কী মনগড়া বিশ্লেষণ!

- **রতি বিকৃতি**

'...ভোরের প্রথম আলোয় আমাকে চুমু খেয়ে জিগ্যেস করলে—নতুন বউঠান, নামটা তোমার পছন্দ হয়েছে?' কা. সু. নো.। পৃষ্ঠা-১৩।

"তুমি আমাকে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরলে।" পূর্বোক্ত। পৃষ্ঠা-১৭।

'বৃষ্টির মধ্যে মালতীলতার আড়ালে তুমি হঠাৎ আমাকে বুকের মধ্যে টেনে নিলে।' পূর্বোক্ত। পৃষ্ঠা-২৯।

'মনে হল প্রবল বৃষ্টির মধ্যে তোমার শরীর গলে যাচ্ছে আমার শরীরের মধ্যে। মনে হল আমার শরীর মিশে যাচ্ছে তোমার শরীরে।' পূর্বোক্ত। পৃষ্ঠা-২৯।

'...অন্ধকারে রাত্তিরবেলা আমাকে জড়িয়ে ধরে তুমি বললে, নতুন বউঠান, কী তোমাকে দহিছে, আমি জানি।' পূর্বোক্ত। পৃষ্ঠা-৪৫।

'আচমকা তোমার ঠোঁট আদর করল আমার উন্মুখ গ্রীবা।' পূর্বোক্ত। পৃষ্ঠা-৪৯।

'ঠাকুরপো, আমি জানতাম না আমার শরীরে এখনও এত আগুন ছিল। তুমিও কি ভাবতে পেরেছিলে? তুমি হয়তো না জেনেই তোমার বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরেছিলে সেই আগুন। আমার আগুন ঠাকুরপো ছড়িয়ে পড়ল তোমার সারা শরীরে। তুমিও গেলে ঝলসে। আমার আদরে ছিল সেদিন লুকনো কান্না। আমার শরীরে চিতার শিখা। তুমি আঁকড়ে ধরেছিলে সেই অন্ধকার দহন।

ঠাকুরপো, অমন আদর এ-জীবনে আর পাইনি।' পূর্বোক্ত। পৃষ্ঠা-৬৮।

'আমি ধীরে তোমার বুকের মধ্যে মুখটি গুঁজে ভুলে গেলাম আর সব কিছু।' পূর্বোক্ত। পৃষ্ঠা-১১৩।

বলাই বাহুল্য এসবই রবীন্দ্রনাথ এবং কাদম্বরী দেবীর শারীরিক সম্পর্কের রগরগে বর্ণনা। তথ্যবিকৃতির কথা ভুলেও যাই যদি, তবুও এহেন বর্ণনার জন্য রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে ক্ষমা করা যায় না কখনোই। তৎকালীন ঠাকুরবাড়ির পারিবারিক আবহ কি এতই চটুল ছিল যে যখন-তখন দেওর-বউদি সম্ভোগে রত হতে পারত! এত লোকজন, এত দাসদাসী যেখানে! যেখানে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে

বলেছিলেন, 'আমাদের সকলেরই পা পিছলিয়েছে—রবির কিন্তু কখনো পা পিছলোয় নি।' ('গুরুদেব ও শান্তিনিকেতন'-সৈয়দ মুজতবা আলী। পৃষ্ঠা-৪৩) সেখানে রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের এহেন লঘুতা আবিষ্কার করলেন কোথা থেকে? এই প্রসঙ্গে প্রশান্তকুমার পালের মন্তব্যটি ভীষণ তাৎপর্যপূর্ণ—'মাতৃহারা দেবর রবীন্দ্রনাথকে তিনি প্রায় মাতার স্নেহেই যত্ন করেছেন, স্নেহ-বুভুক্ষু রবীন্দ্রনাথও তাঁকে এক সময়ে একান্তভাবেই আশ্রয় করেছিলেন...' (রবিজীবনী। ২য় খণ্ড। পৃষ্ঠা-২০৫)। রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বর্ণিত রবীন্দ্রনাথ-কাদম্বরীর শরীরী বিবরণ তো প্রশান্তকুমার পালের বিশ্লেষণকে নস্যাৎ করে দেয়। সেটা কি আদৌ গ্রহণযোগ্য? অমিতাভ চৌধুরী দ্বিধাহীনভাবে বলেছেন—'কাদম্বরী দেবী প্রচলিত অর্থে রবি-অনুরাগিণী নন। কিন্তু অনুরাগ তো শুধু কামের আজ্ঞাবাহী নয়। যথার্থ অনুরাগ আসে সুন্দরের শুভ্রতা নিয়ে, অমলিন মাধুর্য নিয়ে। রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন লালন করেছেন নতুন বৌঠানের স্মৃতি...। এই সম্পর্ক শুধু জৈব ব্যাখ্যা দিয়ে হয় না।' অথচ রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এই মাধুর্যের সম্পর্কটাকে ক্লেদাক্ত করেছেন, তিক্ত করেছেন। বাংলা সাহিত্যে পদকর্তা বা কবিজীবন নিয়ে রচিত উপন্যাসের যে ফলবতী ধারা আমাদের সমৃদ্ধ করেছে সেই ধারার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অমাবস্যার গান' (ভারতচন্দ্রের জীবনভিত্তিক), শিবাশিস মুখোপাধ্যায়ের 'কাহ্ন' (কাহ্নপাদের জীবনভিত্তিক), সুরঞ্জন প্রামাণিকের 'সোনালী ডানার চিল' (জীবনানন্দ দাশের জীবনভিত্তিক), অভিজিৎ চৌধুরীর 'সমাগত মধুমাস' (মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জীবনভিত্তিক)। রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কাদম্বরীদেবীর সুইসাইড-নোট'— পূর্বোক্ত উপন্যাসগুলির সঙ্গে কোনোভাবেই এক পঙ্‌ক্তিতে বসার যোগ্য নয়। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে কাদম্বরী দেবী তো কবি নন। কিন্তু তাঁকে নিয়ে রচিত উপন্যাসে যে রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় বারংবার আশ্রয় করেছেন রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনকে। আর সেখানেই ভরপুর বিকৃতি। অন্ততপক্ষে কবির জীবনভিত্তিক উপন্যাস কেমনতর হতে পারে, রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় তার একটা পাঠ পূর্বে উল্লিখিত উপন্যাসগুলি থেকে নিতে পারেন।

◆ বাহান্ন টাকার জন্য

কাদম্বরী দেবীকে নিয়ে এমনতর অপপ্রচেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে, ঠাকুরবাড়ির একটি সিদ্ধান্তের দিকে আঙুল তোলা যায়। এই মৃত্যুসংবাদ যাতে সংবাদপত্রে না প্রকাশিত হয়, তার জন্য ঠাকুরবাড়ি থেকে বাহান্ন টাকা খরচ করা হয়েছিল। (রবিজীবনী। প্রশান্তকুমার পাল। দ্বিতীয় খণ্ড। পৃষ্ঠা-২০৬-২০৭)। বরঞ্চ এটা না করলেই ভালো হত। ইন্দিরাদেবী এই

আত্মহত্যার পিছনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের খেয়ালিপনাকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। বিরজিতলাওয়ের বাড়িতে থেকে যাওয়া যেমন আছে (মনে রাখতে হবে জোড়াসাঁকোয় তখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জন্য কাদম্বরী দেবী অপেক্ষা করছেন), তেমনি আছে জাহাজে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনাও। ইন্দিরাদেবী জানিয়েছেন—'জ্যোতিকাকামশায় যে জাহাজের ব্যবসা ধরেছিলেন, সেই জাহাজে একদিন গান-বাজনা আমোদ-প্রমোদ কি হবে, নতুন কাকিমাকে পরে নিয়ে যাবার কথা ছিল; কিন্তু ভাঁটা পড়ে যাওয়াতে জ্যোতিকাকামশায় বুঝি নিতে আসতে পারেন নি। শুধু এইটুকুর জন্য অমন প্রচণ্ড আঘাত ও অভিমান তো আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে স্বাভাবিক বলে মনে হয় না।' এই মান-অভিমানে কোথাও কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নেই। বরং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী-অবহেলার বিষয়টিই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। হয়তো কাদম্বরী দেবীর পারিবারিক প্রেক্ষাপট এবং ঠাকুরবাড়িতে যে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যঙ্গের মানসিকতায় কাদম্বরী দেবী বিচার্য হতেন, তার ঢেউ জ্যোতিরিন্দ্রনাথকেও স্পর্শ করেছিল। সবচেয়ে অর্থবহ পূর্বে বর্ণিত ইন্দিরা দেবীর বক্তব্যের শেষাংশটি 'তবে ভিতরে আরও কিছু হয়তো ছিল যা এখন জানবার কৌতূহল আছে।' (রবিজীবনী। প্রশান্তকুমার পাল। দ্বিতীয় খণ্ড। পৃষ্ঠা ২০৬)। এখানে 'হয়তো' শব্দটির ব্যবহার সুনিশ্চিত কারণের পরিবর্তে, দ্বিধাকেই উপস্থাপিত করে। সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ করতে গিয়ে হাজারটা অনুমান আর মিথ্যে সন্দেহের রাস্তা খুলে গেল নিমেষে। এবং যে কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর কারণ নির্ণয়ের কোনো প্রয়োজন ছিল না, তিনিও রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপকীর্তির নায়িকা হয়ে উঠলেন। ঠাকুরবাড়িতে স্কুলছুট রবীন্দ্রনাথ এবং বাজার-সরকার শ্যাম গাঙ্গুলির মেয়ে কাদম্বরী (নিজেরা পিরালী ব্রাহ্মণ বলে যার সঙ্গে বাধ্য হয়ে দেবেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিয়ে দিয়েছিলেন)—উভয়েই ছিলেন প্রান্তিক। এহেন দুটি মানুষের মধ্যে অনিন্দ্যসুন্দর সখ্য গড়ে উঠবে সেটাই তো স্বাভাবিক। বিশেষত, যেখানে রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তার উন্মেষে কাদম্বরী দেবীর অনুপ্রেরণা চিরস্মরণীয়। অথচ এই সুন্দর সম্পর্কটা রঞ্জন-লেখনীতে কদর্য হয়ে উঠেছে।

ছয়

শুধু রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ই নন, জগদীশ ভট্টাচার্যও কাদম্বরী দেবীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অন্যরকম সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন। মে ১২, ২০০১ তারিখে, 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় নিত্যপ্রিয় ঘোষ লিখেছেন—'রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন, কবির নতুন বৌঠান ছিলেন কবির মাতৃস্থানীয়া, বন্ধুস্থানীয়া। জগদীশবাবু মানেন না, তিনি এক অতিরিক্ত 'নিরুদ্ধ বাসনা' খুঁজে পেয়েছেন।' যদিও আমরা বারংবার বলে থাকি 'কবিরে পাবে না তার জীবনচরিতে', তবুও তাঁর জীবনের

অপ্রয়োজনীয় দিকগুলো খুঁচিয়ে তোলার কী দুর্মর বাসনা আমাদের। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কাদম্বরী দেবীর সম্পর্কের প্রকৃতি নিয়ে আর রহস্য নেই কোনো, বিশেষত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এবং রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব বাচনের পর। নিঃসন্তান কাদম্বরী দেবীকে নিয়ে তাই কতই না গালগল্প—

অ. কাদম্বরী দেবী রবীন্দ্রনাথের বিয়ে মেনে নিতে না পেরে আত্মহত্যা করেছেন।

আ. জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অস্বাভাবিক সম্পর্কের প্রতিক্রিয়ায় কাদম্বরী আত্মহত্যা করেছেন।

ই. জনৈকা অভিনেত্রীর প্রেমপত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জোব্বার পকেটে পাওয়ার অভিঘাতে কাদম্বরী আত্মহত্যা করেছেন ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি।

তার ওপর এই নতুন উপদ্রব 'কাদম্বরীদেবীর সুইসাইড-নোট'। কত বাঙালি যে এটাকে প্রকৃতই সুইসাইড-নোট ভেবে গোগ্রাসে গিলেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। অথচ এই ধারণাগুলোর একটারও কোনোরকম বাস্তব ভিত্তি আজও খুঁজে পাওয়া যায় না। অরুণকুমার বসু বলেছেন '...রবীন্দ্রজীবন সম্পর্কিত কিছু স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে দু'চারজন মোদক শ্রেণির লেখক তেলেভাজা খাস্তাকচুরি বিক্রি করে মেদবৃদ্ধি ঘটাচ্ছেন। অহো কী দুঃসহস্পর্ধা! কিন্তু তাঁরা আশ্রয় পেয়েও যাচ্ছেন।' (দেশ-১৬ অগ্রহায়ণ ১৪২০, ৮১ বর্ষ ৩ সংখ্যা, পৃষ্ঠা : ৬৪)। তাঁরা যে আশ্রয় পাচ্ছেন, এটাই আমাদের কাছে চরম লজ্জার!

◆ সুনিশ্চিত নন প্রভাতকুমারও

অবাস্তবতাকে নিয়ে আমাদের এত আদর কেন? যেখানে কিনা 'রবীন্দ্রজীবনকথা'য় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জানাচ্ছেন 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী কাদম্বরী দেবী অকস্মাৎ আত্মহত্যা করলেন; কারণ অজ্ঞাত। তবে শোনা যায়, পারিবারিক মনোমালিন্যই নাকি এর কারণ।' (আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। অগ্রহায়ণ ১৩৯২। পৃষ্ঠা-২৭)। মাননীয় পাঠক 'নাকি' শব্দটির ব্যবহার দেখুন। অর্থাৎ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ও সুনিশ্চিত নন যে বিষয়ে, সেখানে রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনগড়া ধারণার উৎস কোথায়? তবে কি শুধুই ফ্যান্টাসি?

◆ যে কঠিন সত্য বঞ্চনা করে না

নিঃসন্তান কাদম্বরী দেবীর মাতৃবৎসলতার প্রধান লক্ষ্য ছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং মাতৃহীন রবীন্দ্রনাথ কাদম্বরী দেবীর মধ্যে পেয়েছিলেন মাতৃস্নেহের আস্বাদ—এই সহজ সরল সত্যটাকেই উপেক্ষা করব আমরা?!

◆ অবশেষে

কাকতালীয় কিনা জানি না, তবে কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর আট বছর পরে ১২৯৯ বঙ্গাব্দের শ্রাবণে 'সাধনা' পত্রিকায় 'জীবিত ও মৃত' নামে রবীন্দ্রনাথের যে বিখ্যাত ছোটোগল্পটি প্রকাশিত হয়, তার কেন্দ্রীয় নারী চরিত্রের নাম 'কাদম্বিনী'। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নতুন বউঠানের ভাগ্যবিড়ম্বিত, অশান্তিময় জীবনকথা ভোলেননি সারা জীবনেও। তাই কি আরও এক ভাগ্যবিড়ম্বিত নারীর জীবন আঁকতে গিয়ে নতুন বউঠানের বিবাহ পূর্ববর্তী নামটিকেই আশ্রয় করতে হল তাঁকে? এই নিয়েও তো দ্বিমত নেই আজও, যে সত্যি সত্যিই কাদম্বিনী থুড়ি কাদম্বরী 'আত্মহত্যা করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন তিনি জন্ম-জন্মান্তরে জীবিত থাকিবেন!' সে মহা বিড়ম্বিত কল্পিত সুইসাইডনোটেই হোক অথবা ঘুমিয়ে থাকা ইতিহাসের পাতায়। আর রবীন্দ্রনাথকে কলুষিত ক'রে (যদিও সেটা একটা ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র, কেই বা-তাঁকে কলঙ্কিত করতে পেরেছে, কেই-বা পেরেছে তাঁর কীর্তিকে ছুঁতে) বাণিজ্যিক সুবিধে পাওয়া যায় হয়তো সাময়িক, মহাকাল কিন্তু কলুষরচক, কলঙ্করটকদের অবজ্ঞাই করে।

উল্লেখপঞ্জি

১. অমিতাভ চৌধুরী : *একত্রে রবীন্দ্রনাথ,* প্রথম খণ্ড, কলকাতা; দে'জ পাবলিশিং, আগস্ট ২০১২।

২. ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী : *রবীন্দ্রনাথ,* কলকাতা; বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, শ্রাবণ ১৪১৭।

৩. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : *রবীন্দ্রজীবনকথা,* কলকাতা; আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, অগ্রহায়ণ ১৩৯২।

৪. প্রশান্তকুমার পাল : *রবিজীবনী,* দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা; আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, সেপ্টেম্বর ২০১৩।

৫. রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় : *কাদম্বরীদেবীর সুইসাইড-নোট,* কলকাতা; পত্র ভারতী, জুলাই ২০১৪।

৬. সন্দীপন সেন : *আহাম্মকের রবীন্দ্রচর্চা,* কলকাতা; অনুষ্টুপ, ডিসেম্বর ২০১৩।

৭. সুব্রত রুদ্র : *কাদম্বরী দেবী,* কলকাতা; প্যাপিরাস, নববর্ষ ১৪০৯।

৮. সৈয়দ মুজতবা আলী : *গুরুদেব ও শান্তিনিকেতন,* কলকাতা; মিত্র ও ঘোষ, ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ।